Vol. 40 | No. 1 | 1996

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আরবী বর্ণের বাংলা প্রতিবর্ণায়ন : ভাষাতাত্ত্বিক পর্যালোচনা

Volume	40
Issue	1
Year	1996
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	এ, টি, এম, ফাখরুদ্দিন, মোঃ আঃ মান্নান মোল্লা
Published online	October 1, 1996
DOI	10.62328/sp.v40i1.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v40i1.6
Pages	87-108
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

আরবী বর্ণের বাংলা প্রতিবর্ণায়ন : একটি ভাষাতাত্ত্বিক পর্যালোচনা

এ, টি, এম, ফাখরুদ্দিন
মোঃ আঃ মান্নান মোল্লা

'আরবী একটি আন্তর্জাতিক ভাষা' নানাবিধ প্রয়োজনে বাঙ্গালী সমাজ এর সাথে জড়িত। যে কোন ভাষার সঠিক উচ্চারণ না হলে তার অর্থ বদলে যায়। আরবী ভাষার ক্ষেত্রে তা অত্যন্ত গুরুত্বর। মাতৃভাষায় শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদেশী ভাষাকে নিজস্ব বর্ণে প্রকাশ করার প্রচেষ্টা স্বাভাবিক ব্যাপার। তবে আরবী বর্ণের প্রতিবর্ণীকরণের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে সুষ্ঠু, সহজ এবং সঠিক কোন নীতিমালা নেই; যা অত্যন্ত জরুরী।

এই প্রবন্ধে 'আরবী বর্ণসমূহের ভাষাতাত্ত্বিক এবং বিশেষত ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে একটা প্রতিবর্ণীকরণ পদ্ধতি নির্ণয় করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। সেই সাথে ইতোপূর্বে যে সব মনীষী এ নিয়ে লিখেছেন বা আলোচনা করেছেন তারও পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি হরফের জন্য বাংলা বর্ণমালার পৃথক পৃথক বর্ণ থাকলে শিক্ষার্থী, পাঠক, গবেষক সকলেরই সুবিধা। মূল শব্দ চিনতে এবং সঠিক উচ্চারণ করতেও তেমন ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকেনা। যদিও আরবী বর্ণমালার সাথে বাংলা বর্ণমালার হুবহু মিল নেই, তবুও ধ্বনিবিচারে শুদ্ধ উচ্চারণের কাছাকাছি পৌঁছা যায় সে চেষ্টাই এ-নিবন্ধে করা হয়েছে।

আরবী ভাষা ও সাহিত্য আজকের বিশ্বসাহিত্যে তার আসন অত্যন্ত পাকাপোক্ত করে নিয়েছে। শুধু মুসলিমদের মাঝেই নয়, অমুসলিম বিশ্বেও আজ আরবী ভাষা চর্চার উৎসাহ পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিশ্বের বিশ কোটিরও বেশি লোক এ ভাষায় কথা বলে। (স্ট্যাটিসটিক্যাল ইয়ার বুক, ১৯৯৪-৯৫-তে উল্লেখিত ১৯৯১ সালের হিসাব অনুযায়ী) বাইশটি দেশের এটা রাষ্ট্রভাষা। তাই বিশ্ব সংস্থাও আরবী ভাষাকে তার অপরিহার্য অঙ্গ মনে করে ; যার বাস্তব প্রমাণ জাতিসংঘ। এ ছাড়া অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং চলমান যাবতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথেও আরবী ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। (আ. ত. ম. মুছলেহ উদ্দীন : ১৯৮৬ : ২৫৬-২৭১)

প্রতিদিন পাঁচবার নামাযে কুরআন শরীফ এর কোন অংশ পাঠ করা ফরয বা অবশ্য কর্তব্য। আর এজন্য কুরআন পাঠের উচ্চারণে ভুল হলে নামায শুদ্ধ হয় না।

একারণেই আরবী উচ্চারণ শিক্ষাশাস্ত্র বা "ইলমুত তাজ্‌বীদ"-এর সৃষ্টি হয়েছে। ক্বুরআন শরীফে আল্লাহ বলেছেন, "বরাত্তিলিল ক্বুরআনা তারতীলা"—অর্থ: 'এবং তারতীলের সাথে ক্বুরআন তিলাওয়াত কর।' (আলকুর আন : ৭৩ : ৪) আর "তারতীল" এর শাব্দিক অর্থ— সহজ ও সঠিক উচ্চারণ (আল মুফরাদাত), স্পষ্ট উচ্চারণ (মাযহারী), (মুহীউদ্দীন খান : ১৯৯৩ : ১৪১৪) Neat, tidy, well-ordered, recitation (Hans wehr : 1960 : 325) "তারতীল" শব্দের অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে হাযরাত 'আলী (রাঃ) বলেছিলেন— "হরফ সমূহের যথাযথ উচ্চারণ এবং বিরাম-স্থান এ সবের সঠিক জ্ঞান সম্মত আবৃত্তি" হলো তারতীল। সম্ভবত এ কারণেই মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন—

> "রুব্বা ক্বারীইন্ ইয়াতলুল ক্বুরআনা ওয়াহুয়া ইয়াল আনুহু"— অর্থাৎ অনেক ক্বারী (ক্বুরআন পাঠকারী, আবৃত্তিকারী) আছে, যারা ক্বুরআন পাঠ করে অথচ ক্বুরআন তাদেরকে অভিশাপ দেয়।" (মিশক্বাত আল মাস্বাবীহ ১ম খণ্ড, : নূযহাতুল ক্বারী : ১৯৬০ : ৪)

হাযারত মুহাম্মদ (সাঃ) এর সময় হতেই নিরবচ্ছিন্ন ভাবে 'ক্বুরআন'-এর (শুদ্ধ উচ্চারণসহ) শিক্ষার প্রচলন রয়েছে। আমাদের দেশের স্কুল-কলেজগুলোতে ইসলামিয়াতের সাথে 'আরবী পাঠের ব্যবস্থা রয়েছে; কিন্তু ব্যবস্থাটা এতই জটিল যে, একজন শিক্ষার্থী তার দীর্ঘ দশ-বার বছরের শিক্ষা জীবনে 'আরবী/ইসলামিয়াত পড়েও একটা আরবী বাক্য বলতে সক্ষম হয়না। এমনকি অনেকে দেখে দেখেও আরবী উচ্চারণ করতে পারেনা। এর কারণ শিক্ষার্থীদের মাঝে 'আরবী শিক্ষার আগ্রহের পরিবর্তে কোন ভাবে পরীক্ষা নামক বৈতরনী পার হয়ে যাওয়াকেই মুখ্য উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করা। অবশ্য ব্যতিক্রম যে নেই তাও কিন্তু নয়। হয়ত স্কুল শিক্ষার্থীরা মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মত 'আরবীর প্রতি এতটা গভীরে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করে না (যদিও এরূপ বোধ না করার কোন কারণ নেই) তবুও যেটুকু শিক্ষা গ্রহণ সকলের জন্যই অপরিহার্য তা-ও হয়ে উঠেনা। কারণ 'আরবী হরফ সমূহ তারা বাংলায় লিখে পড়ে থাকে, অথচ 'আরবীকে এর নিজস্ব ভঙ্গিতেই- 'আরবীতেই পড়া উচিত। কেননা এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। (ড: আলা উদ্দীন আল আযহারী- ১৯৭০ : ১৬ এবং ড: মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ : ১৯৫০ : ১) কারণ বিধাতা পৃথিবীতে যে কয়টি ভাষা দিয়েছেন তার প্রত্যেকটিরই আলাদা আলাদা হরফ এবং উচ্চারণ ভঙ্গি, স্বর ইত্যাদি রয়েছে। সুতরাং আরবী বনাম বাংলার ক্ষেত্রেও একথা পুরোপুরি সত্য। উপরন্তু একই ভাষায় স্থান ভেদে

উচ্চারণের পার্থক্য বিদ্যমান আর ভিন্ন ভাষায় তো থাকবেই। (ড: শহীদুল্লাহ্ রচনাবলী : ১৯৯৫ : ৩৮৭)

আরবী হরফ সমূহের বাংলা প্রতিবর্ণায়ন বা অনুলিখন (Transliteration) এর ক্ষেত্রে যেহেতু কোন সুষ্ঠু ও স্বীকৃত নীতিমালা নেই তাই এক এক বইতে এক এক রকম ভাবে লেখা থাকে। যদিও ড: সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ড: মুহম্মদ এনামুল হক প্রমুখ এ বিষয়ে লিখেছেন এবং তৎপরবর্তিতেও অনেকে আলোচনা করেছেন, কিন্তু এতে সমস্যার সমাধান হয়নি [দ্র: ড: এনামুল হক : আরবী বাংলা অভিধান, পৃ. ১৭] বরং দ্বিধা-সন্দেহ আরও বেড়ে গেছে, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুসৃত নীতি, Royal Asiatic Society-র নীতির সাথে বিসদৃশ্য, আবার বাংলা একাডেমীর অভিধানের সাথে অন্যান্য বইয়ের নীতি মেলেনা। আর এতে করে শিক্ষার্থী ও সাধারণ পাঠক বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। এমনকি মাদ্রাসা শিক্ষিত অনেক লোকও তা বুঝে উঠতে পারে না।

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, আরবীকে তার নিজস্ব ভাবধারায় এর স্বকীয়তা বজায় রেখেই শিক্ষা করা উচিত; কিন্তু প্রাথমিক বা মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আরবীর কোন প্রায়োগিক বা ব্যবহারিক পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা না থাকায়— যেমনটি অন্য বিষয়ে বিশেষত বিজ্ঞান ও কৃষি শিক্ষায় রয়েছে— বাধ্য হয়েই এমন কিছু নিয়মের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়, যাতে অন্তত এটুকু ধারণা নেয়া যায় যে "শিক্ষার্থী আরবী বাক্য বা ক্বুরআন/হাদীছ দেখে দেখে তিলাওয়াত করতে সক্ষম" কিংবা কোন "পাঠক যাতে বাংলা অনুলিখন দেখে বুঝতে পারে যে এর পরিবর্তে আরবী অমুক হরফটি ছিল।" আর এটা আরবী হরফের সঠিক উচ্চারণকে বাংলায় সরাসরি প্রতিবর্ণায়ন বা অনুলিখন ছাড়া অসম্ভব।

তবে আরবী হরফ সমূহের প্রতিবর্ণায়নের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা দেখা দেয়। বিশেষত বাংলার ক্ষেত্রে এ সমস্যা বেশ প্রকট। কারণ বাংলা ভাষায় যদিও আরবীর তুলনায় হরফ বেশী তবুও আরবীর বর্ণমালার সাথে বাংলার বর্ণমালার হুবহু মিল নেই। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবর্ণায়ন রীতি অনুসারে চৌদ্দটি এবং ড: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে নয়টি নতুন হরফের দরকার হবে। (শহীদুল্লাহ্ রচনাবলী: ১৯৯৫ : ৩৮৯) এর পরও আরবী হরফের পুরোপুরি সঠিক উচ্চারণ হবার নয়। তবে প্রতিবর্ণের সংখ্যা কমিয়েও আরবী হরফের উচ্চারণের প্রায় কাছাকাছি উচ্চারণ নির্ধারণ করা যেতে পারে। কারণ প্রতীকের চেয়ে ধ্বনিকেই প্রাধান্য দে'য়া হয়। ড: আব্দুল হাই বলেন—

> ধ্বনি বিজ্ঞানীদের কাছে ধ্বনির অক্ষর বা প্রতীক বড়ো নয়, ধ্বনিই সর্বেসর্বা। তাদের মতে যে কোন প্রতীকের সাহায্যেই যে কোন ধ্বনির প্রতিলিপি নির্মাণ

করা যায়, তবে সুবিধা অসুবিধার কথা ভেবে তাঁরা তা করেন না। প্রাচীন সংস্কার এবং অক্ষরের ঐতিহাসিক মূল্যকেই বড় স্থান দিয়ে থাকেন। (মুহম্মদ আবদুল হাই : ১৯৭৫ : ৭০)

এ জন্যই প্রতিবর্ণায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান হরফগুলোর সামঞ্জস্য খুঁজে বের করা এবং একই সাথে তাদের ধ্বনির সঠিক উচ্চারণ হ'ল কিনা তা খতিয়ে দেখা দরকার।

আরবী হরফের উচ্চারণ তথা ধ্বনিগত প্রতিবর্ণায়ন করতে হলে প্রথমেই "ইলমুত তাজ্‌বীদ" ('আরবী ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কিত শিক্ষাশাস্ত্র)-এর আশ্রয় গ্রহণ অপরিহার্য। আর বাংলা হরফ সমূহের ধ্বনিগুণ ও মাখরাজ বা উচ্চারণ স্থান (point of Articulation) সম্পর্কেও যথার্থ জ্ঞান আবশ্যক। 'মাখরাজ' এর সাথে সাথে হরফের 'স্বিফাত' তথা বৈশিষ্ট্যাবলীও দেখতে হবে। কারণ একই স্থান থেকে ভিন্ন ভিন্ন হরফও বের হয়ে থাকে।

প্রতিবর্ণীকরণ বা অনুলিখন প্রসঙ্গে ড: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেন—

অনুলিখন প্রণালী স্থির করিতে হইলে চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক হইবে (ক) আরবী প্রভৃতির ধ্বনিকে তার সদৃশ বা প্রায়-সদৃশ বাংলা ধ্বনি দ্বারা প্রকাশ (খ) আরবী প্রভৃতির যে অনুরূপ বাংলা ধ্বনি স্থির হইবে, তাহাই সর্বত্র ব্যবহার করিতে হইবে। (গ) প্রণালীটি কার্যে প্রয়োগযোগ্য হইবে (ঘ) সহজ বোধ্য হইবে।" (ড: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ : ১৯৯৫ : ৩৮৪)

ধ্বনির সঠিক বিচারের জন্য আবার কতগুলো নিয়ম রয়েছে মুহম্মদ আব্দুল হাই এর ভাষায়—

(ক) জিভের স্থান, (খ) জিভের উচ্চতার পরিমাণ এবং ঠোঁটের অবস্থানের দিক থেকে বিচার করে স্বর ধ্বনির বৈশিষ্ট্য নিরূপন করা যায়। ব্যঞ্জন ধ্বনি চিহ্নিত করার এবং একটি থেকে অন্যটির পার্থক্য সূচিত করার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া চারটি আবার কখনো কখনো পাঁচটি। যেমন: (ক) উচ্চারণের স্থান (খ) উচ্চারণের স্থানে বায়ুপথের রূপ (গ) তালুর নরম অংশ বা কোমল তালুর অবস্থা ('ক' এবং 'খ' এর মধ্যে যদি তার উল্লেখ না থাকে) (ঘ) স্বরযন্ত্রের অবস্থা ('ক' কিংবা 'খ' এর মধ্যে যদি তার উল্লেখ না করা হয়) এবং (ঙ) স্বল্প প্রাণতা এবং মহাপ্রাণতা (মুহম্মদ আব্দুল হাই : ১৯৭৫ : ৪৩)

এসব দিক থেকে আরবী এবং বাংলা হরফ সমূহের একটা রূপ যথাক্রমে দেখা যেতে পারে। আরবীতে মূল উচ্চারণ স্থান বা 'মাখরাজ' পাঁচটি যথা ১। কণ্ঠ ২। মুখগহ্বর ৩। দন্ত ৪। ওষ্ঠ এবং ৫। নাসামূল। এদের মধ্যে আবার দ্বিতীয়টি দুই ভাগে বিভক্ত (ক) জিহবা মূল ও (খ) তালু। তৃতীয়টি তিন ভাগে (ক) দন্তমূল (খ) দন্ত (গ) দন্তৌষ্ঠ। এ সব স্থানে ১৭টি 'মাখরাজ' আছে। ১৬টি হরফের, একটি 'গুন্নাহ' বা সুর এর। (ক্বারী মুহাম্মদ ইব্রাহীম : ১৯৬০ : ৪ ও সীবাব্াইহ : ১৯৬৮ : ৪০৪-৪৬৮) আর রয়েছে কতগুলো 'স্বিফাত' বা গুণ। 'ইলমুত তাজ্বীদ' অনুসারে 'স্বিফাত' হচ্ছে ৪৪টি তবে এর মধ্যে ১৭টি খুবই প্রসিদ্ধ। প্রখ্যাত ভাষা বিজ্ঞানী ড: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এ সব 'মাখরাজ' ও গুণ-বৈশিষ্ট্যের কিছু বিবরণ দিয়েছেন তার "আরবী ফারসী নামের বাংলা লিপ্যন্তর" প্রবন্ধে। হরফগুলির 'মাখরাজ' ও স্বিফাত' বিবেচনায় এদের একটি ধ্বনিতাত্ত্বিক নাম নিচে দেওয়া হল :

ঘোষ গলনালীয় উষ্ম ধ্বনি

ع আইন

Vioced pharyngeal fricative sound

অঘোষ গলনালীর উষ্ম ধ্বনি।

ح বাঃ

Voiceless pharyngeal fricative sound

অঘোষ শ্বাস উষ্ম ধ্বনি।

ح হা

Voiceless breathed fricative sound

অঘোষ কণ্ঠ্য উষ্ম ধ্বনি।

خ খা

Voicealess uvular fricative sound

ঘোষ কণ্ঠ্য উষ্ম ধ্বনি।

غ গাইন

Voiced uvular fricative sound

ঘোষ কণ্ঠ্য স্পৃষ্টষ্ট ধ্বনি।

ق ক্বাফ

Voiced uvular stop sound

অঘোষ জিহ্বা মূলীয় স্পৃষ্ট ধ্বনি।

ك কাফ

Voiceless verlar stop sound

ঘোষ তালব্য স্পৃষ্ট ধ্বনি।

ج জীম

Voiced palatal stop sound

অঘোশ তালব্য-দন্তমূলীয় উষ্ম ধ্বনি।

ش শীন

Vioceless palato-alveolar fricative sound

ঘোষ দন্তমূলীয় পার্শ্বিক মহাপ্রাণ উষ্ম ধ্বনি।

ض দোয়াদ

Voiced alveolar lateral fricative emphatic sound

অঘোষ দন্তমূলীয় তালব্য মহাপ্রাণ উষ্ম ধ্বনি।

ص সোয়াদ

Voicaless alveolar-Palatal fricative emphatic sound

অঘোষ দন্তমূলীয় তালব্য অল্পপ্রাণ উষ্ম ধ্বনি।

س সীন

Voiceless alveolar-Palatal fricative non-emphatic sound

ঘোষ দন্তমূলীয় তালব্য অল্প প্রাণ উষ্ম ধ্বনি।

ز যাঃ

Voiecd alveolar-Palatal fricative non-emphatic sound

ঘোষ দন্তমূলীয় স্পৃষ্ট মহাপ্রাণ ধ্বনি।

ط তোয়া

Voiced alveolar stop emphatic sound

অঘোষ দন্তমূলীয় স্পৃষ্ট অল্পপ্রাণ ধ্বনি।

ت তাঃ

Voicaless alveolar stop non-emphatic sound

ঘোষ দন্তমূলীয় স্পৃষ্ট অল্পপ্রাণ ধ্বনি।

د দাল

Voiced alveolar-stop non-emphatic sound

ঘোষ অন্তর্দন্ত্য, শ্বাসজাত মহাপ্রাণ ধ্বনি।

ظ যোয়া

Voiecd interdental fricative emphatic sound

অঘোষ অন্তর্দন্ত্য, শ্বাসজাত অল্প প্রাণ ধ্বনি।

ث ছাঃ

Voiceless interdental fricative non-emphatic sound

ঘোষ অন্তর্দন্ত্য, শ্বাসজাত অল্পপ্রাণ ধ্বনি।

ذ যাল

Voiced interdental fricative non-emphatic sound

ঘোষ দন্ত্য কম্পনজাত ধ্বনি।

ر রাঃ

Voiced dental trill sound

ঘোষ দন্ত্য পার্শ্বিক ধ্বনি।

ل লাম

Voiced dental-lateral sound

ঘোষ দন্ত্য নাসিক্য ধ্বনি।

ن নূন

Voiced dental-nasal sound

ঘোষ দন্তৌষ্ঠ শ্বাসজাত ধ্বনি।

ف ফা

Voiced labio-dental fricative sound

ঘোষ ওষ্ঠ্য স্পৃষ্ট ধ্বনি।

ب বা

Voiced bilabial stop sound

ঘোষ ওষ্ঠ্য নাসিক্য ধ্বনি।

م মীম

Voiced bilabial nasal sound

ঘোষ ওষ্ঠ্য অর্ধস্বর ধ্বনি।

و ওয়াও

Voiced bilabial semi-vowel

এবং

ঘোষ পশ্চাৎ জিহ্বৌষ্ঠ্য দীর্ঘ স্বর ধ্বনি।

Voiced labio-velar long vowel

ঘোষ দীর্ঘ 'অ' ধ্বনি।

ا আলীফ

Voiced long 'a' sound

ঘোষ তালব্য অর্ধস্বর ধ্বনি।

ي ইয়া

Voiced palatal semi-vowel

এবং

ঘোষ তালব্য দীর্ঘ স্বরধ্বনি।
Voiced palatal long vowel
কণ্ঠনালীয় স্পৃষ্ট ধ্বনি।
হামযাহ
Glottal stop sound

এ রীতি ইমাম খালীল ইবন আহমদ প্রদত্ত এবং ইমাম ইবনে জুন্নীও সীবাবাইহ কর্তৃক অনুসৃত নীতি অনুযায়ী প্রণীত। ইংরেজী ভাষায় এদের একটি Symbol বা প্রতীক সহ আরবী ধ্বনি ও ভাষা বিজ্ঞানী M.H. BAKALLAH তার বেশ কয়েকটি গবেষণাপত্রে মূল আরবী বই সমূহ যেমন— আল খলীল এর কিতাব আল 'আইন, ইবনেজুন্নীর "সিররে স্বিনা'আত আল ই'অরাব" এবং সীবাবাইহ এর "আল কিতাব" থেকে উল্লেখ করেছেন। Symbolগুলো পূর্ব ধারা মোতাবেক এই 'ḥ, h, x, ġ, q, k, j, š, d, ṣ, s, z, ṭ, t, d, ẓ, ṯ, ḏ, r, l, n, f, b, m, w, ū, ā, y, ī, এবং ẓ (Bakallah : 1984 : 26, 27)

বাংলা ভাষার হরফগুলির ও উচ্চারণের রীতি ও উচ্চারণ অনুযায়ী ধ্বনিতাত্ত্বিক নাম রয়েছে। যেমন— 'ক' জিহ্বামূলীয় অঘোষ ও অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনি, (Unvoiecd unaspirated velarplosive sound) 'খ' এর মহাপ্রাণ বা aspirated ধ্বনি, আবার 'গ' একই স্থানের অল্পপ্রাণ ঘোষ ধ্বনি (voiced unaspirated) এবং 'ঘ' এর মহাপ্রাণ রূপ (aspirated sound), 'ঙ' আবার nasal consonant phoneme বা মূল নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি।

'চ' এর নাম "প্রশস্ত দন্তমূলীয় অঘোষ অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনি (Dorso-alveolar বা palato-alveolar voiceless unaspirated plosive sound), আর 'ছ'-এর মহা প্রাণ বা (aspirated) ধ্বনি। 'জ'-ও 'চ' এর মত তবে এটা ঘোষ ধ্বনি (voiced) আর 'ঝ' হচ্ছে 'জ' এর মহাপ্রাণ (aspirated) ধ্বনি। আর " 'ঞ' নাসিক্য অঞ্চলের তালব্য 'ন' যা আমেরিকান ধ্বনিতাত্ত্বিকদের কাছে মূল Phoneme এর সদস্য (member) হিসেবে allophone তথা অন্তর ধ্বনি বা সহ ধ্বনি।" (মুহম্মদ আ: হাই ১৯৭৫ : ৮৫)। 'চ' বর্গীয় ধ্বনিগুলো অঞ্চল ভেদে স্পৃষ্ট (Plosive), ঘৃষ্ট (affricate), শিস্ (fricative) ইত্যাদি নামে পরিচিত। এভাবে সবগুলো বর্ণেরই নাম রয়েছে। এসব বিশ্লেষণে যে বিষয়টি পরিষ্কার হয় তাহল কোন একটি ভাষার অধিকাংশ ধ্বনির সাথে অন্য যে কোন ভাষার অধিকাংশ ধ্বনির মিল থাকার নীতি হিসাবে বাংলার সাথে 'আরবীরও যথেষ্ট—হুবহু নয়—মিল দেখা

য-ফলা

১.৮.১ যে সব তৎসম শব্দে অন্তঃস্থ য স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয় সে-সব শব্দে দ্বিমতের অবকাশ নেই। কিন্তু এমন কিছু শব্দ আছে যে-সব শব্দে য-এর ব্যবহার সংক্ষিপ্ত আকারে অর্থাৎ য-ফলা হিসেবে। এ জাতীয় শব্দগুচ্ছ সাধারণত প্রত্যয় নিষ্পন্ন। যেমন,

[ক] সংস্কৃত 'য' কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয় দুইই। কৃৎ প্রত্যয় য-এর আদি রূপ; ক্যঙ্, ক্যপ্ ন্যাৎ, যঙ, যৎ। এ সব প্রত্যয়ের সাহায্যে সাধিত শব্দে য-ফলা ব্যবহারের কোন বিকল্প নেই। যেমন, ভৃত্য; বিদ্যা; শ্রাব্য; লভ্য; ব্যাখ্যেয়।

[খ] তদ্ধিত প্রত্যয় 'যৎ, 'ন্য', 'ষ্যঞ্' স্থানে য বা য-ফলা হয়। যেমন, পৌরোহিত্য; গ্রাম্য; ন্যায্য; দিব্য; সাম্রাজ্য; কৌলীন্য; চৈতন্য; বৈমুখ্য; সাহায্য।

১.৮.২ কিছু সাধিত শব্দে (তৎসম) 'য' ও 'অ' দুটি প্রত্যয়ই সিদ্ধ। যেমন, চারিত্র/চারিত্র্য; দারিদ্র/দারিদ্র্য; বৈচিত্র/বৈচিত্র্য; বৈশিষ্ট/বৈশিষ্ট্য; বৈদগ্ধ/বৈদগ্ধ্য। লেখকদের রচনায় দুটি বানানের উপস্থিতিই লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথের বইয়ের নাম *চারিত্রপূজা*। এই 'চারিত্র'-এ য ফলা নেই। কাজী নজরুল ইসলামের 'দারিদ্র্য' কবিতার বানানে আবার তা রয়েছে। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঘোষের *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান* (দ্বিতীয় খণ্ড)-এ (১৯৮৬:১৬৪০) য-ফলাহীন বৈদগ্ধ' অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ জাতীয় শব্দে য-ফলা বর্জন করে 'চারিত্র'; 'দারিদ্র'; 'বৈচিত্র'; 'বৈশিষ্ট'; 'বৈদগ্ধ' লেখা যেতে পারে।

ঙ, ঞ, অনুস্বার [ং]

১.৯.০ সংস্কৃত অনুস্বার ব্যঞ্জন বর্ণের পরে বসে আশ্রিত ব্যঞ্জনকে আংশিক অনুনাসিকতা দান করত (সুনীতিকুমার; ১৯৮৯:৫০১)। ঙ্-এর উচ্চারণও অনুরূপ। কিন্তু ঞ্-এর উচ্চারণ স্বতন্ত্র। এ তিনের পার্থক্য :

(ক) শব্দের আদিতে ও ব্যঞ্জন বর্ণের শেষে ঙ্ বসে না।

(খ) 'ঙ' ও 'ঞ' অন্য ব্যঞ্জনের পূর্বে বসে যুক্ত ব্যঞ্জনরূপে ব্যবহৃত হয়।

(গ) অনুস্বার কখনো ব্যঞ্জনের আগে বসে যুক্ত ব্যঞ্জনরূপে ব্যবহৃত হয় না।

১.৯.১ সুসংহত মৌল বা একাক্ষর বিশিষ্ট শব্দে অনুস্বার হয় না, 'ঙ্' হয় এবং তা যুক্ত ব্যঞ্জনরূপে। যেমন,

(ক্) ঙ্ + ক = ঙ্ক : অঙ্ক; পঙ্ক; ডঙ্ক; বঙ্কিম; কঙ্কাল; শঙ্কা; কঙ্কণ; লঙ্কা।

(খ) ঙ্ + খ = ঙ্খ : উচ্ছৃঙ্খল; পঙ্খি; বিশৃঙ্খল; শঙ্খ; শৃঙ্খলা।

(গ) ঙ্ + গ = ঙ্গ (ঙ্গ) : অঙ্গ; বঙ্গ; অঙ্গার; মঙ্গল; ভঙ্গুর; লবঙ্গ; গঙ্গা; সঙ্গ; পঙ্গপাল।

(ঘ) ঙ্ + ঘ = ঙ্ঘ : জঙ্ঘা; লঙ্ঘন।

১.৯.২ চ-বর্গীয় ব্যঞ্জনের পূর্বে যুক্ত বর্ণ হিসেবে 'ঞ' ব্যবহৃত হয়। ধ্বনিগত অবস্থানের তারতম্য ভেদে 'ঞ' উচ্চারণ কখনো 'ন্'; কখনো 'গঁগ্যা' হয় (অশোক মুখোপাধ্যায়; প্রাগুক্ত: ৭৭)। কিন্তু সেই স্বাধীনতা তৎসম শব্দের বানানে গ্রহণ করা যাবে না। 'ঞ' ব্যবহৃত হয় এমন তৎসম শব্দগুলি হচ্ছে :

(ক) ঞ + চ = ঞ্চ : অকিঞ্চন; চঞ্চল; পঞ্চাশ; কিঞ্চিৎ; কুঞ্চন; ক্রৌঞ্চ; চঞ্চু; পঞ্চ; মঞ্চ; সিঞ্চন; বঞ্চনা।

(খ) ঞ্ + ছ = ঞ্ছ; বাঞ্ছিত; লাঞ্ছনা।

(গ) ঞ্ + জ = ঞ্জ: অঞ্জন; অঞ্জলি; কুঞ্জ; খঞ্জ; গঞ্জিকা; গুঞ্জন; চিরঞ্জীব; জঞ্জাল; ধনঞ্জয়; পঞ্জর; পুঞ্জ; ভঞ্জন; প্রাঞ্জল; ব্যঞ্জন; মঞ্জু; মঞ্জুষা; রঞ্জন; শিঞ্জন; সঞ্জাত; সামঞ্জস্য।

(ঘ) ঞ্ + ঝ = ঞ্ঝ: ঝঞ্ঝা; ঝঞ্ঝাট; নির্ঝঞ্ঝাট।

১.৯.৩ ব্যঞ্জন সন্ধিতে ম্-এর পর ক-বর্গীয় ও প-বর্গীয় বর্ণ থাকলে ম্-এর স্থানে অনুস্বার হয়। যেমন,

[ক] ক-বর্গীয় ব্যঞ্জন : সংস্কার; সংস্কৃত; শংকর; সংকট; সংকলন সংকল্প; সংকীর্তন; সংকুচিত; সংকুলান; সংকেত; সংক্রমণ; সংক্রান্তি; সংক্ষিপ্ত; সংখ্যা; সংগত; সংগম; সংঘ; সংঘটন; সংঘর্ষ; সংঘাত।

[খ] প-বর্গীয় ব্যঞ্জন : সংপ্রচার; সংবৎসর; সংবদ্ধ; সংবরণ; সংবর্ধনা; সংবল; সংবাদ; সংবাহক; সংবাহন; সংবিদ; সংবুদ্ধ; সংবৃত।

১.৯.৪ ম্-এর পর য, র, ল, ব কিংবা শ, ষ, স, হ থাকলে ম-স্থানে অনুস্বার হয়। যেমন, সংযোগ; সংরাগ; সংলগ্ন; সংযত; সংহার; সংশ্লিষ্ট; সংযম; সংযুক্ত; সংসদ।

যায়। স্বল্প সংখ্যক হরফে প্রতিবর্ণায়ন সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দেয়। তবে বর্ণের যৎসামান্য রদ বদল করে এ সমস্যা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। আর পাঠক যখন মনে রাখবেন যে, বাংলা হরফে তিনি বাংলা ভাষা নয় বরং আরবী ভাষাই পাঠ করছেন, তখন তেমন পরিবর্তন ছাড়াও এ সমস্যা কাটানো কোন সমস্যা নয়।

যে সব হরফ জটিলতা ছাড়া প্রতি বর্ণায়ন করা যায় সেগুলো হল ঃ

ا (আলিফ)	—	অ	ل (লাম)	—	ল
ب (বা)	—	ব	م (মীম)	—	ম
ت (তা)	—	ত	ن (নূন)	—	ন
ج (জীম)	—	জ	ه (হা)	—	হ
خ (খা)	—	খ			
د (দাল)	—	দ			
ر (রা)	—	র			
ش (শীন)	—	শ			
ف (ফা)	—	ফ			
ك (কাফ)	—	ক			

বাকী যে সব হরফ থাকল এ গুলো সম্পর্কে আলোচনার অবকাশ রয়েছে।

প্রথমে 'তা' (ت) বর্ণের সাথে সম্পর্কিত 'তোয়া' (ط) প্রসঙ্গে আসা যাক। 'মাখরাজ' (point of articulation) এর দিক থেকে উভয়টি একই স্থানের। দাল (د)-ও এই একই স্থানের। তথাপি উচ্চারণ ভিন্ন। কারণ একই বর্গের হলেও উচ্চারণ পার্থক্যের কারণেই পৃথক প্রতীক হয়েছে। (ت) তা বর্ণের বৈশিষ্ট্য হলো। "মাহমূসা, শাদীদা" (অঘোষ ও অল্পপ্রাণ), 'ইসতিফাল' অর্থাৎ নিম্নগতি (voiceless non-emphatic)। আর এটি সরাসরি বাংলা হরফ 'ত' এর গুণ। কিন্তু তোয়া হরফটির বৈশিষ্ট্য হল 'যিহর' (এটি তা (ت) এর গুণের বিপরীত) 'শিদ্দা' অর্থাৎ কঠোরতা এবং স্পৃষ্ট, 'ইসতিলা" অর্থাৎ জিহ্বার উচ্চগতি 'ইত্ববাক্ব' - (জড়িত হওয়া) (এটি দাল থেকে তোয়াকে পৃথক করেছে) এবং 'ক্বালক্বালাহ'- (কম্পনজাত) তথা - voiced emphatic trill। সুতরাং 'তা' এবং তোয়া উভয়ের প্রতীক একই হতে পারেনা। উদাহরণতঃ (تَارِكٌ) এবং (طَارِقٌ) প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ ও অর্থ উভয়ই পৃথক কিন্তু বাংলায় তারিক বা তারেক (যদিও এ-কার দেয়া ভুল) লিখলে বুঝার উপায় নেই এটি কোন শব্দ; উল্লেখিত শব্দদ্বয়ের প্রথমটি না শেষটি। প্রথমটির বাংলা বর্ণায়নে 'তারিক' এবং দ্বিতীয়টির 'ত্বারিক্ব'

হলে প্রতি বর্ণায়ন যেমন সঠিক হয়, তেমনি উচ্চারণ এবং পরিচিতিতে ও কোন সমস্যা থাকেনা। অতএব (ت) 'তা' বর্ণের জন্য 'ত' এবং 'তোয়া' (ط) বর্ণের জন্য 'ত' এর নিচে ব সংযুক্ত করে লিখা দরকার। উল্লেখিত শব্দ দু'টি থেকে আরও একটি সংশয় এসে দাঁড়ায় 'কাফ' (ك) এবং 'ক্বাফ' (ق) নিয়ে। এতে ও 'তা' এবং 'তোয়া'র মতই সমস্যা। 'কাফ (ك) যেটি হাল্কা সেটির উচ্চারণ স্থান "আস্ফাল আল লিসাম ওয়ামা ফাওক্বাহা মিন হানাক 'আলা' (velar of prevelar)" যার ধ্বনিতাত্ত্বিক নাম voiceless velar stop বা অঘোষ জিহবা-মূলীয় স্পৃষ্ট ধ্বনি। আর 'ক্বাফ' (ق) এর "মাখরাজ' "আক্বস্বা-আল-লিসান ওয়ামা ফাওক্বাহা মিন হানাফ 'আলা' (uvular of post uvular)" যার ধ্বনিতাত্ত্বিক নাম (voiced uvular stop) বা ঘোষ কণ্ঠ্য স্পৃষ্ট ধ্বনি। আর বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেও অনেকটা 'তা' এবং 'তোয়া'র মতই। 'অনেকটা' এ'জন্য যে 'কাফ' এবং 'ক্বাফ' এ দু'টিতে 'ইজলাক্ব' বা প্রান্ত হতে বের হওয়া একটি অতিরিক্ত স্বিফাত আছে। সুতরাং 'তা' এবং 'তোয়া'র ন্যায় এখানেও একটিতে শুধু 'ক' এবং অন্যটিতে 'ক' এর নিচে ব সংযুক্ত করে লিখা উচিত। বাল্য বয়সে যখন মক্তবে পড়তাম, তখন উস্তাদ সাহেব বড় কাফ এবং ছোট কাফ হিসাবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। দুই ফোটা যুক্তটি বড় এবং ফোটা বা নুকতা বিহীনটি ছোট। এ হিসাবে (ق) কে বড় টাইপের অক্ষরে (ক) এবং (ك) কে ছোট অক্ষরে লিখলেও চলে। আর এ পরিচিতি বাংলা ভাষা ভাষীদের কাছে নতুন নয়, যার স্বীকৃতি দিয়েছেন ভাষা পণ্ডিত ড: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। (মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ : ১৯৯৫ : ৩৯১)।

এই একই সমস্যা (ح) "হা-আল হুত্বী" এবং (ه) "হা-আল হাওয়াজ" এর ক্ষেত্রে, যাদেরকে আমাদের দেশে জীমের পাশের 'হা' এবং ইয়ার পাশের 'হা' নামে বলতে শুনা যায়। এক্ষেত্রে কেউ কেউ "হা-আল হুত্বী"কে হ লিখে সাথে (ঃ) বিসর্গ যুক্ত করে এবং "হা-আল হাওয়াজ" কে শুধু হ লিখতে মত দেন। (শ্রীহরেন্দ্র পাল ১৩৬৮ : ৩১) আবার কেউ কেউ প্রথমটির জন্য হ লিখে উপরে একটি বক্র রেখা (⁓) টানার প্রস্তাব করেছেন, কেউ আবার নিম্নরেখ হ্ লিখতে বলেছেন (ড: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্) আবার ইংরেজী Script অনুসারে হ লিখে নিচে ফোটকী দেওয়ার প্রস্তাব করেছেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তবে এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব পাওয়া যায় ড: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে, তা হল (ح) এর জন্য বড় অক্ষরের হ এবং (ه) কে ছোট অক্ষরে লিখা। কারণ বাংলা দেশে (ح) কে বড় হা এবং (ه) ছোট হা বলার প্রথা আছে। (ড: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্- ১৯৯৫ :

৩৯০)। যেহেতু দু'টি হরফের মধ্যে উচ্চারণ স্থানের সামান্য পার্থক্য ছাড়া অন্য কোন বিপরীতমুখী বৈশিষ্ট্য নেই।

প্রসঙ্গক্রমে বলা আবশ্যক যে, আরবী শব্দের শেষদিকে কোন কোন সময় (ة) তা যুক্ত থাকে কখনো স্ত্রী লিঙ্গের চিহ্ন হিসেবে, কখনো নামের অংশ হিসেবে আবার অন্য কারণেও। এই সব শব্দের (ة) এ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় হসন্ত সহ (হ্) বা ত লিখতে প্রস্তাব করেছেন। এ প্রস্তাব মূলত সংকটের সৃষ্টি করে। এজন্য যে 'ত' বা 'হ' যে যার মত ব্যবহার করলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে। দ্বিতীয়ত শব্দের শেষে যে 'তা'টি গোল অবস্থায় আমরা দেখতে পাই, এটির নাম, 'ত' "আল মারবুত্বাহ।" যখন ঐ 'তা' বিশিষ্ট শব্দে থামতে হয়, তখনই মাত্র ঐ 'তা' কে হ (হসন্ত সহ) উচ্চারণ করা যায়। বরং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ঐ 'তা' এর উচ্চারণ উহ্য থাকে যেমন (عَائِشَةُ) এর উচ্চারণ আয়েশা, (آمِنَةُ) এর উচ্চারণ আমিনা, (رَابِعَةُ) এর উচ্চারণ রাবিয়া ইত্যাদি। এ সব ক্ষেত্রে বিসর্গ লেখা যেত, কেননা বিসর্গকে অঘোষ হ বলা হয় যা হসন্ত যুক্ত হ এর অপর নাম। কিন্তু (ء) 'হামযাহ' হরফের প্রতিবর্ণীকরণের ক্ষেত্রে সমস্যা এড়ানোর জন্য হসন্ত সহ (হ্) লিখাই ভাল। আর না থেমে 'হরকত' বা স্বরচিহ্ন সহ পড়ে গেলে সেখানে 'তা' উচ্চারণ করতে হয়। সে ক্ষেত্রে প্রতি বর্ণায়নেও 'ত' লিখতে হবে। তবে (ت) 'তা' "আল মাম্‌দুদাহ" থেকে পৃথক করার জন্য 'ত্' এর নিচে হসন্ত দেয়া যেতে পারে (শহীদুল্লাহ্ রচনাবলী : ১৯৯৫ : ৩৮৯)

আলোচ্য 'খাফীক' (خَفِيف) হাল্কা ও 'ছাক্বীল' (ثَقِيل) ভারী বা 'সরু ও মোটা' স্বর এর এ সমস্যা (د) 'দাল' ও (ض) 'দোয়াদ' এবং অনেকাংশে (س) 'সীন' ও (ص) 'সোয়াদ' এর ক্ষেত্রেও দেখা যায়।

মূলত 'দোয়াদ' (ض) এর উচ্চারণ স্থান হলো "আওয়াল হাফফাতি আল্ লিসান ওয়ামা ইয়ালীহা মিন আধরাস" (the interior side of the tongue against the molars), জিহ্বা পার্শ্ব ও দক্ষিণ বা বাম ভাগস্থ শ্বাদন্তের পশ্চাদ্বর্ত্তী পঞ্চ দন্ত মূল; আর দাল (د) এর উচ্চারণ স্থান "বাইনা ত্বারাফ আল লিসান ওয়াফুয়াইক্ব আল ছানায়া" (the tip of the tongue is against the area wich is a little further bak from the teeth)। মিল যা আছে তাহ'ল দু'টি হরফই 'মাজহুরা' বা স্পষ্ট, উচ্চ শব্দ বিশিষ্ট তবে উচ্চারণ স্থান পৃথক হওয়া ছাড়াও 'দাল' (د) এ আছে 'শিদ্দা' বা কঠোরতা আর 'দোয়াদ' এ আছে তার বিপরীত গুণ 'রিখওয়া' বা কোমলতা, 'দোয়াদ'- 'মুত্ববাক্ব' (velarized of emphatic), আর 'দাল' তার বিপরীত 'মুনফাতিহ' (non-velarized of non-emphatic), (ض) 'দোয়াদ' এর বৈশিষ্ট্য হল 'ইস্বতিত্বালাত' বা দীর্ঘ হওয়া, দাল এরূপ নয়। 'দোয়াদ'

হবে 'তাফখীম' অর্থাৎ মোটা উচ্চারণে আর দাল তার বিপরীত 'তারক্বীক্ব' বা সরু উচ্চারণে। তাই 'দাল' (د) এর ধ্বনিতাত্ত্বিক নাম (voiced alverolar stop non-emphatic) বা ঘোষ দন্তমূলীয় স্পৃষ্ট অল্পপ্রাণ ধ্বনি আর 'দোয়াদ' (ض) এর নাম (voiced alveolar lateral fricative emphatic) বা ঘোষ দন্তমূলীয় পার্শ্বিক মহাপ্রাণ উষ্ম ধ্বনি। সুতরাং 'দাল' এর জন্য 'দ' এবং 'দোয়াদ' এর জন্য 'ধ' নির্ধারণ করা যুক্তিসঙ্গত। দ-এবং ধ এর মধ্যে অল্পপ্রাণ এবং মহাপ্রাণ হওয়া ছাড়া কোন পার্থক্য নেই; কিন্তু 'দাল' ও 'দোয়াদ' এ পার্থক্য যেমন উচ্চারণ স্থানের তেমন বৈশিষ্ট্যেরও। এজন্য 'দ' অক্ষরের সাথে ব সংযুক্ত করে লিখা হলে 'দোয়াদ' এর প্রতিবর্ণায়ন 'ধ' এর চেয়ে বেশী যথার্থ (accurate) হবে বলে প্রতীয়মান হয়। সে ক্ষেত্রে (ض) = দ্ব হবে। বর্ণ দ্বিত্ব হয়ে যাবে এই অজুহাতে এবং বর্ণ সংখ্যা না বাড়ানোর যুক্তিতে এ প্রতীক বর্জন করা যেতে পারে। তবে ব সংযুক্ত করে লিখায় কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু যুগ যুগ ধরে চলে আসা (ض) এর প্রতিবর্ণ 'য' বা 'জ' সম্পূর্ণটাই ভুল। এ কারণে 'ফরধ' হয়েছে 'ফরয' 'ব্ধু' হয়েছে অযু বা অজু। 'রামদ্বান' কে বলা হয় রমযান বা রমজান। কারণ "(ض) এর জ বা জ উচ্চারণ বাংলা নহে পার্সী ও হিন্দুস্থানী" (ড: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ : ১৯৯৫ : ৩৯১)।

(ج) 'জীম' (ذ) 'যাল' (ظ) 'যোয়া' এবং (ز) 'যা' এর প্রতিবর্ণীকরণ যেমন সমস্যা তেমনি উচ্চারণেও রয়েছে সুক্ষ্ম অথচ বেশ গভীর পার্থক্য।

(ج) এর 'মাখরাজ' জিহ্বা মধ্য ও তৎসন্নিহিত তালু বা "ওয়াসাত্ব আল লিসান বাইনা হা ওয়া বাইনা ওয়াসাত্ব আল হানাক আল আ'লা" (Palatal) আর বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেও 'জ' এর অতি কাছে। সুতরাং 'জীম' এর জন্য 'জ' নির্বাচন করা যায় বিনা বাক্যব্যয়ে এবং কোন মতপার্থক্য ছাড়াই। বাকী রইল 'যাল' (ذ) 'যোয়া' (ظ) এবং (ز) 'যা'। এই তিনটি হরফ একই মূল স্থান থেকে উচ্চারিত হয়। প্রথম দু'টি "জিহ্বাগ্র ও উপর পাটির সম্মুখস্থ দুই দন্তাগ্র থেকে" অপরটি "জিহ্বাগ্র ও নিচের পাটির সম্মুখস্থ দুই দন্তাগ্র।" গুণ-বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, যোয়া, এর 'ইসতিলা' (জিহ্বার উচ্চগতি) ও 'ইত্বাক্ব' (জড়িত হওয়া) এদুটি গুণ একে 'যাল' ও 'যা' থেকে পৃথক করেছে। আর 'যা' এর যে পৃথক বৈশিষ্ট্য (স্বিফাত) আছে তাহল এটি 'স্বাফীর' শিষ (sibilant) ধ্বনি। অন্যদু'টি নহে। এখন 'যাল' এর যে গুণগুলো দেখা যায় তা হল 'জিহর' (উচ্চ শব্দ), 'ইসতিফাল' (জিহ্বার নিম্নগতি) [যা 'যোয়া' হরফের বৈশিষ্ট্যের বিপরীত] 'ইনফিতাহ' (মুক্ত হওয়া) [এটিও যোয়ার গুণের বিপরীত]। এ সব গুণ (ز) 'যা'-র ও।

ইংরেজী (z) এবং 'আরবী (ز) একই রকম উচ্চারণ ও গুণ বৈশিষ্ট্যের। আর বাংলায় এর রূপ হল 'য', যাকে 'অন্তঃস্থ য' বলা হয়। এটি মূলতই বাংলা ভাষা আরবী ভাষা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে ড: মুহম্মদ আব্দুল হাই বলেন— "ইংরেজী (z) কিংবা আরবী (ز) বা (ذ) জাতীয় ধ্বনির যথার্থ প্রতিলিপি বাংলা অন্তঃস্থ য।" (মুহম্মদ আব্দুল হাই : ১৯৭৫ : ১০২; ৩২২-২৪) ড: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ অবশ্য (ز) কে জ তে লিখতে প্রস্তাব করেছেন। দু'টি কারণে "(১) উর্দু, পারসী ও তুর্কীতে (ذ, ز, ض, ظ) এই চারটি অক্ষরকেও 'জ' দিয়া লিখবার আবশ্যকতা (২) (z) এর জন্য 'জ' উচ্চারণের জন্য 'য' (বিদেশী শব্দের ক্ষেত্রে) বাছাই করা।" (মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ১৯৯৫ : ৩৮৭)

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইংরেজী (z) এর বাংলা প্রতি বর্ণ 'য' তেমনি 'আরবী (ز. ذ) এর ও যথার্থ প্রতিলিপি 'য'। তাছাড়া 'জ' উচ্চারণের জন্য 'জ' রাখাই উচিৎ আর (ز) বা (z) তে 'য' লিখাই সুবিধার। পরিবর্তনের কোন আবশ্যকতা নেই। দ্বিতীয়ত পারসী বা তুর্কী উচ্চারণের দিকে চিন্তাকরে প্রতিবর্ণ নির্ধারিত হবে না কারণ আমরা প্রতিবর্ণ স্থির করছি আরবীর। সুতরাং আরবী (ز) হরফের জন্য "অন্তঃস্থ য"-ই প্রযোজ্য। আর 'যাল (ذ) কে পৃথক করার জন্য অন্য যে কোন পরিবর্তনের মাধ্যমে গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন য ইত্যাদি। আর 'যোয়া' বর্ণের জন্য 'য' এর নিচে 'ব' সংযুক্ত করে লেখা যেতে পারে।

(ع) 'আইন, (ء) হামযাহ এবং (ا) আলিফ এর উচ্চারণে যেমন পার্থক্য আছে প্রতিবর্ণীকরণে ও তার প্রতিফলন থাকা দরকার। 'হামযাহ' যদিও স্বরবর্ণ নয় তবুও স্বরবর্ণ 'আলিফ' এর মতই অনেকটা উচ্চারণ হয়। 'অনেকটা' এ কারণে যে, দু'টো হরফ ই 'অ'-শ্রুতির। হরকতের সাথে সাথে দু'টিই পরিবর্তিত হয়। 'হামযাহ' হল কণ্ঠ বর্ণ (glottal stop) বা "আকস্বা আল-হালাক্ব" (larynx) আর 'আলিফ' উচ্চারিত হয় 'জাওফ' বা মুখের খালি স্থান থেকে। 'হামযাহ' উচ্চারণের সময় ধ্বনি রুদ্ধ হয়, তাই এর গুণ 'শিদ্দা' বিপরীতে 'রিখওয়া' (মৃদুতা) হল 'আলিফ' এর গুণ। 'লীন' বা কোমলতাও 'আলিফ' এর একটি গুণ। কাজেই 'আলিফ' এর জন্য 'অ' (এবং স্বরচিহ্নের পরিবর্তনে যখন যে রূপ হয় তা, (যেমন— ই, উ) নির্ধারণ করা ভাল। আর 'হামযাহ'র জন্য (ঃ) বিসর্গ ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত। কারণ "বাংলা বিসর্গ আন্তঃস্বর যন্ত্রজাত (glottat, laryngeal) ধ্বনি; যা আরবীর হামযাহ।" (মুহম্মদ আব্দুল হাই : ১৯৭৫ : ১০)

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, বাংলা "বিসর্গ" শব্দের শুরুতে ব্যবহৃত হয় না এমনকি আধুনিক ভাষায় পদান্তেও এর ব্যবহার কম। সন্ধিতে বাদ পড়ছে আর পদের মাঝেও কম ব্যবহৃত হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে উত্তর হলো, আরবী হরফ "হামযাহ" তো

শব্দে স্বতন্ত্র অস্তিত্বে ব্যবহৃতই হয় না। (আল আযহারী : ১৯৭০ : ৩) যা বিসর্গের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে বরং এটি বাংলা চন্দ্র বিন্দুর মত অন্যের ঘাড়ে চেপে বসে থাকে (কি 'আলিফ'-কি 'ইয়া'। কোন বাছ বিচার করেনা।) কাজেই শব্দের শুরুতে 'হামযাহ' থাকলে তা ঐ শব্দের আশ্রয় দাতা হরফটির সাথে উচ্চারিত হয়ে যাবে, এবং লিখার ক্ষেত্রে ঐ হরফটির অব্যবহিত পরে লিখলেই সমস্যা থাকবে না। যেমন 'আরবী (أَصْلٌ) হলে প্রতিবর্ণে "আঃ মানা" ইত্যাদি হবে। আর বাংলা ভাষায় বিসর্গের ব্যবহার আধুনিক কালে কম হলেও আরবী ভাষায় কিন্তু তার উল্টো হচ্ছে।

এবার 'আইন প্রসঙ্গ, 'আইন (ع) হরফটির 'মাখরাজ' হল "আওসাতু-আল-হালাক্ব" (pharynx) বা কণ্ঠের মধ্যভাগ। আর বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেও এটি 'হামযাহ' ও 'আলিফ' থেকে পৃথক। এটি 'শাদীদাহ' ও 'রিখওয়াহ' এর মধ্যবর্তী উচ্চারণের অর্থাৎ এটি liquid বা তরল বর্ণ। 'হা' আল হুত্তী'র মত এটিও যথেষ্ট কষ্টসাধ্য এবং চাপা উচ্চারণের। মধ্যবর্তী গুণটি বাদ দিলে 'আলিফ' এর সাথে এর পুরো মিল দেখা যায়। তাই (ع) এর জন্য অ লিখে উল্টো কমা বা শুধু উল্টো কমা ব্যবহার করা অধিকতর শুদ্ধ।

প্রতিবর্ণীকরণ বা অনুলিখনের ক্ষেত্রে 'ছা' (ث) 'সীন' (س) এবং 'সোয়াদ' (ص) এ তিনটি হরফে সবচেয়ে বেশি জটিলতা বিরাজ করছে বিশেষতঃ আমাদের দেশে। সালাত, সালাম, সওয়াব, সবুর, বিসমিল্লাহ, হাদীস ইত্যাদি শত-সহস্র শব্দ দেখে কোনভাবেই বুঝা যাবে না কোনটির 'আরবী 'ছা' কোনটির 'সীন' কিংবা কোনটি 'সোয়াদ' বর্ণের। কারণ সবগুলোর ক্ষেত্রেই 'দন্ত্য-স' লিখা হয়। আর এ কারণেই (إِسْلَامٌ) এর উচ্চারণ করতে শুনা যায় 'ইশলাম (سَلَامٌ) এর উচ্চারণ করা হচ্ছে 'শালাম' যা সম্পূর্ণরূপে উল্টো অর্থজ্ঞাপন করে। সঙ্গত কারণেই এদের প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র প্রতীক থাকা দরকার।

(ث) 'সা' বের হয় "জিহবাগ্র ও উপরের পাটির সম্মুখস্থ দুই দন্তাগ্র" থেকে। যেখানে থেকে 'যোয়া' এবং 'যাল' ও বের হয়। আর 'সীন' ও 'সোয়াদ' এর 'মাখরাজ' "জিহবাগ্র ও নিচের পাটির সম্মুখস্থ দুই দন্তাগ্র" যেখান থেকে 'যা' (ز) ও বের হয়। বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে (ث) 'সা' (ص) 'সোয়াদ' (س) 'সীন' তিনটিই 'মাহমুসাহ' (নিম্নশব্দ)। কিন্তু 'ইসতিলা' (জিহ্বার উচ্চগতি), 'ইত্ববাক্ব' (জড়িত হওয়া) এবং 'স্বাফীর' (শিশ) এগুলো 'সোয়াদ' এর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য যা অন্য দু'টি থেকে একে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। (সীবাবৃইহ : ১৯৬৮ : ৪১২) অবশ্য শেষোক্ত গুণটি 'সীন' (س) হরফেরও আছে। সুতরাং বলা যায় যে, (ث) 'ছা' হরফের ধ্বনি 'সীন' এবং 'সোয়াদ' উভয়টি থেকেই সম্পূর্ণ পৃথক।

ইমাম খালীল এর মতে (ث) হরফটিও 'স্বাফীর' বা (fricative) যা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে কিন্তু ইমাম যাজরী তা স্বীকার করেন না। মূলত এ হরফটি fricative নয়; কারণ জিহ্বাগ্র এবং উপর পাটির সম্মুখের দুই দন্তাগ্রে আঘাত করে শিশ ধ্বনি বিহীন 'স' উচ্চারণ করতে চেষ্টা করলে (ث) এর প্রকৃত উচ্চারণ হবে। এটি 'থ' ও 'স' এর মধ্যবর্তী। অপরদিকে বাংলা 'ছ' হরফটির সাথে 'ছা' এর ধ্বনিতাত্ত্বিক ও ব্যাকরণগত সামান্য পার্থক্য থাকলেও বাংলা ভাষাভাষী মুসলিমদের উচ্চারণে এর কোন পার্থক্য দেখা যায় না। সুতরাং 'আরবী (ث) এর জন্য 'ছ' কে নির্বাচন করা যুক্তিযুক্ত।

'সীন' (س) এর জন্য 'দন্ত্য-স' কে নির্বাচন করা যায়। বাংলা বর্ণসমূহের মধ্যে 'স' হলো উষ্ম বা শিষজাত ধ্বনি চারটির একটি। অবশ্য "সুক্ষ্মতা বিচারে দন্ত্য-স হলো তালব্য-শ এর দন্ত্য সহ ধ্বনি (Allophone)।" (মুহম্মদ আব্দুল হাই : ১৯৭৫ : ১০০) "সাধারণ বাঙ্গালী সমাজের উচ্চারণে শ ও স এর মধ্যে তেমন পার্থক্য দেখা যায় না।" (শেখ মিজান : ১৪০৩ : ৫৪-৬৬) তবে "স-র খাঁটি উচ্চারণ ঋ, ক, গ, ত, থ, ন, প, ফ, র-এর সঙ্গে মিলিত অবস্থায় দেখা যায় যেমন— সৃত, স্কন্ধ, স্খলন, হস্ত, স্থান, স্পষ্ট, স্ফটিক, স্রাব।" (প্রেক্ষণ ১৯৯৬ : ২০ এবং মুহম্মদ আব্দুল হাই, ১৯৭৫ : ৩৪০)

'দন্ত্য-স' কে 'তালব্য-শ' এর ন্যায় উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকায় অনেকেই (س) কে 'ছ' দ্বারা লিখতে মত দেন। আবার কেউ কেউ 'ছ' এর নিচে ডট বা ফুটকি দিয়ে লেখার প্রস্তাব করেছেন। (আবু ইসহাক : ১৩৫৮) কিন্তু চলিত বাংলায় 'ছ' একটি নির্দিষ্ট ধ্বনির প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 'ছ' তালব্য বর্ণ আর 'স দন্ত্য' বর্ণ। এদিক থেকে 'আরবী (س) এর উচ্চারণ 'ছ' দিয়ে করলে মূল উচ্চারণ না হয়ে বিকৃত উচ্চারণ হবে। তাছাড়া 'ছ' জাতীয় শীষ ধ্বনি হিসেবে 'স' এর ব্যবহার রীতি সিদ্ধ। (মুহম্মদ আব্দুল হাই, ১৯৭৫ : ৩২৫ ও সৈয়দ আলী আহসান : ১৯৯৫ : ১১ এবং জামিল চৌধুরী : ১৯৯৬ : ৩১৭) তদুপরি ইংরেজী (s) ধ্বনির প্রতিরূপ বাংলা স, ছ, নয়। অতএব (س) এর জন্য 'স' নির্ধারণ করা উচিত। আর 'সোয়াদ' এর সাথে 'সীন' এর যে পার্থক্য তাতে 'সীন' এর জন্য নির্ধারণকৃত 'স' এর নিচে ব সংযুক্ত করে 'সোয়াদ' এর প্রতিবর্ণ লিখা সমীচীন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, (ث) 'ছা' কে কেউ কেউ 'থ' বর্ণ লিখে এর উপর তিনটি ফোঁটা দিয়ে প্রকাশ করার পক্ষে মত দেন। (ড: এনামুল হক, ১৯৭০ : ৫) এটি অবশ্য মিশরীয় আঞ্চলিক উচ্চারণের সাথে সঙ্গতি পূর্ণ; কিন্তু 'ছ' দিয়ে প্রকাশ করাই সর্বাধিক শুদ্ধ। কেননা, 'আরবী (ق) 'ক্বাফ' কে মিশর, মালয়েশিয়া সহ কোন কোন স্থানের লোকজন (غ) ঘ কিংবা গ এর মত উচ্চারণ করেন, তা বলে

আমরা অর্থাৎ বাংলা ভাষাভাষীগণ তো 'ক্বাফ'কে 'ঘাইন' এর মত উচ্চারণ করিনা কিংবা বাংলা প্রতিবর্ণীকরণের ক্ষেত্রে কোন লেখকই 'ক্বাফ' কে 'গাইন' এর মত গ/ঘ দিয়ে লিখেন না, এমনকি (ث) কে যারা থ বলতে চান তারাও নন, তাহলে কেন এ স্ববিরোধীতা! দ্বিতীয়ত আমাদের একথা মনে রাখতে হবে যে, আমরা কোন আঞ্চলিক ভাষার উচ্চারণকে মাপকাঠি ধরব না, বরং সর্বক্ষেত্রে প্রচলিত (Standerd Language) কেই উচ্চারণের মাপকাঠি ধরে প্রতিবর্ণায়ন পদ্ধতি স্থির করতে হয়। তৃতীয়ত 'ইলমুত তাজ্‌বীদ' এর কোন নিয়মেই এটির উচ্চারণ থ হয় না কিংবা কোন 'ক্বারী'-ই তা করেননি।

(و) 'ওয়াও' এর প্রতিবর্ণীকরণে ড: সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অব, অও, ঔ, তিনটি রূপের প্রস্তাব করেছেন, ড: শহীদুল্লাহ্'র মতে 'আও' এবং হসন্ত স্থানে 'ও' লেখা ভাল। তবে তাঁর নুতন প্রস্তাবে (وَ = ও, وَا = ওা, وُ = ৱু বা ভূ, وِ = ভি বা ভি'র মত তিনি রেখেছেন। 'ওয়াও' এর 'মাখরাজ' (Point of articulation) ওষ্ঠদ্বয় অর্থাৎ দুই ঠোঁটের মাঝে (বাইনা আল শাফাতাইন)। Phonetic value হিসাবে একে দু'টি নাম দেয়া হয়েছে— Voiced bilabial semi-vowel এবং অপরটি Voiced labio-velar long vowel প্রথমটির Symbol বা ইংরেজী প্রতীক w এবং দ্বিতীয়টির u কিন্তু বাংলায় লিখতে গেলে দুটি স্বরধ্বনির দরকার হয়, যা ড: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ দেখিয়েছেন। কিন্তু 'ও' হলো বাংলা আটটি মৌলিক স্বর ধ্বনির একটি। উচ্চারণের দিক থেকে 'উ'-র সাথে 'ওয়াও' এর মিল দেখা যায়। কিন্তু এটিও (Cardinal) বা মৌলিক স্বরধ্বনি। অথচ ওয়াও ওষ্ঠ্য থেকে হলে অর্ধ স্বরধ্বনি আবার পশ্চাৎ জিহ্বা থেকে আসলে দীর্ঘস্বর ধ্বনি। এর সঠিক প্রতিবর্ণায়নে যৌগিক স্বর ধ্বনি প্রযোজ্য। যেমন ওয়, উই, ইউ, ওএ, ওআ। এ বিষয়ে ধ্বনিবিজ্ঞানী মুহম্মদ আবদুল হাই এর মতামত :

> "আমেরিকান ধ্বনিতাত্ত্বিক অধ্যাপক ফার্গুসন এবং অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর মতে প্রতিষ্ঠিত একাক্ষরিক যৌগিক স্বরধ্বনি চারটির মধ্যে ও, কিংবা উ ওয়াও এর প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম, আবার বাংলায় ইয়ার, এয়ার, ইয়োরোপ, ওয়াড় প্রভৃতি শব্দের দ্রুত ও অস্বাভাবিক পিষ্ট উচ্চারণের ওপর নির্ভর করে এ পরিবেশের অক্ষরের খাদ নির্মাণকারী স্বল্প শ্রুতিব্যঞ্জক ই-এ, এবং ও কে ক্ষেত্র বিশেষে অর্ধস্বরধ্বনি বলা হয়।" (মুহম্মদ আব্দুল হাই : ১৯৭৫ ঃ ৩৬

বাংলা অর্ধস্বর ধ্বনির দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, ব্ শ্রুতি 'আরবী 'ওয়াও' এর সঠিক প্রতিবর্ণ হতে পারে যাকে 'অন্তঃস্থ ব' বলা হয়ে থাকে। বাংলা ভাষায় এর ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। যেমন: মোয়া, কুয়া, পোয়া, নোয়া, রোয়া,

হওয়া, খাওয়া, দেওয়া, নেওয়া ইত্যাদি, এজন্য এক সময় বাংলা বর্ণমালায় দুটো 'ব' দেখা যেত। কিন্তু 'অন্তঃস্থ-ব' এর কোন স্বতন্ত্র রূপ না থাকার কারণে বর্তমানে তা আমাদের বর্ণমালা হতে লোপ পেয়ে বসে আছে। অথচ এটি বাংলা বর্ণমালায় একান্ত অপরিহার্য। ভাষা বিজ্ঞানী ড: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এ কথা বেশ জোর দিয়েই বলেছেন। (প্রেক্ষণ : ১৯৯৬ : ২০) এ প্রসঙ্গে আবদুল হাই বলেন—

"অসমিয়া পেটকাটা 'ব' এর যে ধ্বনি তার সঙ্গে 'আরবী (و) এবং বাংলার অর্ধস্বর 'w'-এর সাদৃশ্য দেখি। খাওয়া, দাওয়া, হাওয়া, দোয়া, মোয়া, মেওয়া, প্রভৃতি শব্দে 'ও' এবং 'য়া'-র মাঝখানে (w) জাতীয় যে ধ্বনিটি শোনা যায় তা অনেক সময় দু'ঠোঁটের সঙ্গে বাতাসের ছোঁয়া লেগে উৎপন্ন হয়। এ ধ্বনিটি রূপায়িত করার জন্যে বাংলাতে আজও কোনো চিহ্ন নির্ণীত হয়নি। বাংলায় 'অন্তঃস্থ-ব' শুধু নামেই আছে, বর্গীয় 'ব' এর সঙ্গে তার সাদৃশ্যগত কোন তফাৎ নেই। এ ধ্বনিটিকে বাংলা হরফে চিহ্নিত করার কোনো ব্যবস্থা না থাকলেও এর ধ্বনিগত আকৃতি তো নষ্ট হয় না। সুতরাং এরও একটি ধ্বনিগত নাম অপরিহার্য ওয়ে ওঠে।"

তিনি এর দুটো নাম দিয়েছেন।

"(i) Semi-vowel বা অর্ধ স্বর ধ্বনি (ii) Voiced unaspirated bilabial fricative sound বা স্বল্পপ্রাণ ঘোষ ওষ্ঠ্য শিষ ধ্বনি। (মুহম্মদ আবদুল হাই, ১৯৭৫ : ১০৭)

আবু ইসহাকও বলেন—

"প্রাচীনকালে বর্গীয় (প-বর্গীয়) ব এবং অন্তঃস্থ ব এর লিপিগত পার্থক্য তো ছিলই, উচ্চারণগত পার্থক্যও ছিল; বর্গীয় ব = b অন্তঃস্থ ব = উঅ, w। আধুনিক বাংলা ভাষায় দু'টি 'ব' এর আকৃতি এক এবং শব্দে অসংযুক্ত অবস্থায় ব্যবহৃত দুটি 'ব'-এর উচ্চারণেও কোনো ভেদাভেদ রক্ষিত হয় না। কিছুকাল আগে থেকে অন্তঃস্থ ব-কে তো বাংলা বর্ণমালা থেকে বর্জনই করা হয়েছে। তাই 'ব' (বর্গীয় ও অন্তঃস্থ) সন্নিবেশিত হয়েছে 'ফ' অক্ষরের পরে। শুধু বুৎপত্তি নির্দেশের স্থলে বর্গীয় ব থেকে পার্থক্য দেখাবার জন্যে অন্তঃস্থ ব-এর রূপ বদলে 'ব্' করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ

করা যেতে পারে যে অন্তঃস্থ ব-কে বর্জন করলেও যুক্তবর্ণে অর্থাৎ ব-ফলায় এর অস্তিত্ব এখনও বিদ্যমান।———" আবু ইসহাক : ১৯৯৩ : ১০-১১)

সুতরাং ধ্বনিমূলক বানান এর জন্য 'ওয়াও' এর প্রতিবর্ণ হিসেবে 'অন্তঃস্থ ব' কে নির্ধারণ করা উচিত এবং বর্গীয় 'ব' থেকে পৃথক করার জন্য অসমিয়া 'ব' এর মত এর নিচে একটি দাগ টেনে নেয়া যেতে পারে।

"আলিফ" ও "ওয়াও" এর মত "য়া" বা "ইয়া" ও 'হরফে লীন' বা কোমল উচ্চারণ বিশিষ্ট অক্ষর। 'জীম' ও 'শীন' এর মত এর উচ্চারণ স্থান "জিহ্বা মধ্য ও তৎসন্নিহিত তালু।" আবার স্বরধ্বনি হিসেবে এটি 'জাওফ' বা মুখ গহ্বর থেকেও উচ্চারিত হয়। তবে ইমাম "সীবাব্াইহ" এর মতে একমাত্র শেষোক্তটিই এর উচ্চারণ স্থান। ইমাম খালীল ইবনে আহমাদের রীতি অনুসারে 'ওয়াও' এর মত এতেও দুটি Phonetic value রয়েছে। ইংরেজীতে এর Symbol 'y' Semi vowel হিসেবে এবং 'i' long vowel হিসাবে। (Bakallah 1984 : 27) ড: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ 'ইয়া' (ي)র জন্য 'য়' বর্ণ নির্ধারণ করেছেন। এটা Semi-vowel উচ্চারণের ক্ষেত্রে খাটে। তবে এই 'য়' দ্বারা বাংলা বর্ণমালার 'অন্তঃস্থ-য়' এবং 'অন্তঃস্থ-ব' এর বাইরে ই-শ্রুতি বুঝতে হবে। কারণ "আমাদের বর্ণমালায় না থাকলেও বাঙ্গালীর কথাবার্তায় এই (ই-শ্রুতি) রকম একটি অর্ধস্বর ধ্বনি পাওয়া যায়।" (মুহম্মদ আবদুল হাই : ১৯৭৫ : ২৭) আর এ অর্ধস্বর ধ্বনির ব্যবহার 'আরবীতে একেবারেই নগণ্য। তুলনামূলকভাবে (ي)-র long vowel টিই বেশি ব্যবহৃত হয়। আর Long vowel এর ক্ষেত্রে বাংলা হ্রস্ব'ই'-কে প্রতিবর্ণ নির্ধারণ করলে যথাযথ হবে। সুতরাং (ي)-র অর্ধ স্বরে 'ই'-শ্রুতি জাতীয় 'অন্তঃস্থ-য়' এবং দীর্ঘস্বরে-'ই' নির্ধারণ করা যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে 'ওয়াও' এবং 'ইয়া' এ দু'টি Long vowel-এ দীর্ঘ ঊ এবং দীর্ঘ ঈ-র প্রস্তাবের পরিবর্তে হ্রস্ব উ এবং হ্রস্ব ই করাতে কোন সমস্যা নেই। এজন্য যে, দীর্ঘ ঈ এবং দীর্ঘ ঊ বর্ণমালায় বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও বাংলার মূল স্বরধ্বনির ব্যবহারিক বিচারে তা পাওয়া যায় না। [খোন্দকার আশরাফ হোসেন প্রণীত বাংলা একাডেমীর ইংরাজী-বাংলা অভিধান এর "উচ্চারণ ও প্রতিবর্ণীকরণ" অংশ দ্রষ্টব্য] দ্বিতীয়ত ধ্বনিতাত্ত্বিক দিক থেকে স্বরের দীর্ঘতা ও হ্রস্বতা বাংলা ভাষায় আভিধানিক পর্যায়ে কোন শব্দের অর্থের তারতম্য ঘটায় না। (জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী সম্পা. : ১৯৯৩ : xii) [বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া] তৃতীয়ত: আরবী শব্দের হ্রস্বতা এবং দীর্ঘতা ইংরেজী ও উর্দুর ন্যায় অর্থের পার্থক্য নির্দেশ করে। তাই বাংলা বর্ণমালার দীর্ঘ ঈ এবং দীর্ঘ ঊ, 'ইয়া' এবং 'ওয়াও' এর "মাদ্দ"-বা দীর্ঘকরে পড়ার ক্ষেত্রে উপস্থাপন করতে হয়। এ সব বিচারে হরফদ্বয়ের ক্ষেত্রে দীর্ঘস্বরের পরিবর্তে হ্রস্ব উ এবং হ্রস্ব ই নির্ধারণ করা সঙ্গত।

আলোচনান্তে এবার 'আরবী হরফ সমূহের একটি প্রতিবর্ণ তালিকা পেশ করা হলো:

আরবী হরফ	নাম	বাংলা প্রতিবর্ণ
ا	আলিফ	অ
ب	বাাঃ	ব
ت	তাাঃ (আল্ মামদূদাহ)	ত
ث	ছাাঃ	ছ
ج	জীম	জ
ح	হাাঃ (আল্হুত্ত্বী)	হ (বড় টাইপের)
خ	খাাঃ	খ
د	দাাল	দ
ذ	যাাল	য
ر	রাাঃ	র
ز	যাাঃ	য
ر	রাাঃ	র
ز	যাাঃ	য
س	সীন	স
ش	শীন	শ
ص	সোয়াদ	স্ব
ض	দোয়াদ	ধ/দ্ব
ط	তোয়া	ত্ব
ظ	যোয়া	য
ع	'আইন	'
غ	ঘাইন	ঘ
ق	ফাাঃ	ফ
ك	ক্বাাফ	ক্ব বা ক (বড় টাইপের)
ل	লাাম	ল
م	মীম	ম
ن	নূন	ন

و	ওয়াও	ব্ (দীর্ঘস্বরে)/উ (অর্ধস্বরে)
ه	হ্যাঃ (আল্ হাওয়াজ)	হ (ছোট টাইপে)
ة	ত্যাঃ (আল মারবুত্বাহ)	হ
ء	হামযাহ	ঃ
ي	ইয়া	ই (দীর্ঘস্বরে)/য় (অর্ধস্বরে)

পরিশেষে কিছু কথা— প্রতিবর্ণায়নের ক্ষেত্রে যে সব আরবী শব্দ বাংলা ভাষায় স্বাভাবিকতা প্রাপ্ত হয়ে বাংলা ভাষার সাথে মিশে গেছে এদের কথা স্বতন্ত্রভাবেই ভাবতে হবে। কিন্তু ধর্মীয় পরিভাষা, নামসমূহ এবং গবেষণামূলক লেখা, অভিধানে, বিশেষত যেখানে ভাষার উচ্চারণ বোধ হওয়া উদ্দেশ্য; সেখানে প্রতিবর্ণীকরণ রীতি অবশ্যই অনুকরণ করা উচিত। (ড: মুহাম্মদ আলাউদ্দিন আল আযহারী ও ড: এনামুল হক : ১৯৭০ : ২১)।

একথা সত্য যে, ঐতিহাসিক যে সব কারণে আমাদের 'আরবী শিক্ষা বিভিন্ন ভাবে ফারসী/উর্দূ উচ্চারণ পদ্ধতি এবং রীতিনীতির জালে আবদ্ধ হয়ে একটা জগাখিচুড়ী মার্কা শিক্ষার সৃষ্টি হয়েছিল (ড: এনামুল হক : ১৯৭০ : ১৬) (যার পরিবর্তন বা সংশোধন বাংলা একাডেমীর সর্বশেষ 'প্রমিত বানান পদ্ধতি'তে ও হয়নি।) দীর্ঘ দিন পরে হলেও তা ক্রমশ দূর হচ্ছে। বিশেষত আমাদের দেশ থেকে যে সব শিক্ষার্থী মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে গিয়ে 'আরবদের সাথে মেলামেশা করেছেন এবং তাদের আসল উচ্চারণ সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন, তাদের সুবাদে এবং সাম্প্রতিক কালের বিভিন্ন বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে আগত 'আরবীয়গণের কল্যাণে। বিশেষত 'আরবীয় পণ্ডিতগণের দ্বারা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ এ ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে।

আরবী শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের যে হাজারো বাধা রয়েছে বাংলা উচ্চারণে আরবী হরফের সঠিক বিন্যাস না হওয়া তার একটি। উচ্চারণ অনুযায়ী বর্ণ নির্ধারণ করা সম্ভব হ'লে অনেক বাধা দূর হতে পারে। অবদান রাখতে পারে আমাদের জাতীয় জীবনেও।

তথ্যপঞ্জী

আবু ইসহাক ১৯৯৩ — সমকালীন বাংলা ভাষার অভিধান। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

আবুল কালাম মঞ্জুর মোরশেদ সম্পা. ১৯৯৫ — শহীদুল্লাহ রচনাবলী (৩য় খণ্ড)। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

আবু তাহের মুহাম্মদ মুছলেহ উদ্দীন ১৯৮৬	আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।
আলাউদ্দীন আল আযহারী ১৯৭০	আরবী বাংলা অভিধান (প্রথম খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
ড: এনামুল হক ১৯৭০	আরবী বর্ণের প্রতিবর্ণায়ন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। (আরবী-বাংলা অভিধানে সংযোজিত)
খন্দকার আব্দুল মোমেন সম্পা. ১৯৯৬	প্রেক্ষণ: ভাষা দিবস সংখ্যা, প্রেক্ষণ সাহিত্য সংগঠন, ঢাকা।
জামিল চৌধুরী ১৯৯৩	বানান ও উচ্চারণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
১৯৯৬	বাংলা বানান অভিধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী সম্পা. ১৯৯৩	ইংলিশ-ব্যাঙ্গলী ডিকশনারী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
ভাষাতত্ত্ব পরিভাষা কোষ উপসংঘ ১৯৭০	ভাষাতত্ত্ব পরিভাষা কোষ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
ড: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ১৯৫০	"আমাদের কওমী যবান আরবী" মাহেনও, ১ম বর্ষ- ১০ম সংখ্যা, পাকিস্তান পাবলিকেশনস, ঢাকা।
১৩৬০ (বঙ্গাব্দ)	"আরবী বর্ণমালা" মাহেনও, ফালগুন; পাকিস্তান পাবলিকেশনস, ঢাকা।
সৈয়দ আলী আহসান ১৯৯৫	দৈনিক ইনকিলাব, ইনকিলাব পাবলিকেশনস, ঢাকা।
মুহম্মদ আবদুল হাই ১৯৭৫	ধ্বনি বিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব, বর্ণ মিছিল, ঢাকা।
মুহীউদ্দীন খান ১৯৯৩	তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন (বাংলা), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা।
মুস্তফা-নূর-উল ইসলাম সম্পা. ১৪০৩ (বঙ্গাব্দ)	"বাংলা ভাষা, সংস্কৃত বানান" শেখ মিজান, সুন্দরম, ঢাকা

হরেন্দ্র চন্দ্র পাল
১৩৬৮
"বাংলা সাহিত্যে আরবী ফার্সী শব্দ সংকলন।" সাহিত্য পত্রিকা ৫ম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ঢাকা।

আব্দুল্লাহ আব্দুল ফাত্তাহ দারবিশ সম্পা.
১৯৬৭
কিতাব আল 'আইন (প্রথম খণ্ড) ইবন আহমাদ, আল-খলীল, আল 'আঈনী প্রেস, বাগদাদ।

আবু সিকিকন, আবু হামিদ,
১৯৭০
আল-ফিক্‌হ আল্ লুঘাহ, দার-আল মা'আরিফ, বৈরুত।

মুস্তাফা আল সাক্কাকা, সম্পা.
১৯৫৪
সিররে স্বিনা'আত, আল'ইরাব, (১ম খণ্ড)। ইবনে জুন্নী, আবুল ফাতাহ উছমান, আল হালাবী প্রেস, কায়রো।

সীবাবাইহি, আবু বিশর 'আমর
১৯৬৮ (পূণর্মুদ্রণ)
আল কিতাব (২য় খণ্ড)। আল বুলাক্ব প্রেস, কায়রো।

BAKALLAH M. H.
1984
ARABIC CULTURE THROUGH ITS LANGUAGE AND LITE RATURE. KEGAN PAUL IN TERNATIONAL, LONDON.

COWAN, J. M.
1960
THE HANS WEHR DICTIONARY OF MODERN WRITTEN ARABIC. LANGUAGE LEARNING SERVICES. JNC. NEW YOURK.

ক্বারী মুহাম্মদ ইব্রাহীম
১৯৬০
নূযহাতুল ক্বারী, আব্বাসিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা।